



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 213 - 229

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

ধনঞ্জয় ঘোষালের গল্প : বাউল ফকির ভুবনের সন্ধানে

মহম্মদ সিদ্দিকুল্লা

বোলুপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Email ID: midsiddhikulla08@gmail.com

 0009-0006-2154-2126

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Baul Fakir,
Man of the Heart,
Achin Pakhi,
Life of Bauls,
spiritual practice,
Ideology of Baul,
Paban Fakir,
Anandadas Baul,
Charandas baul.
Nishi baul,
Chandikhapa,
Ivana.

Abstract

Baul Fakir philosophy is a treasure of Bengali's spiritual life. The meaning of the word 'Baul' is both indefinite and vast. Bauls have various divisions and categories. Baul-Fakirism is not a religion but a form of spiritual practice. In essence, it is a way of life, a path of joyful spiritual discipline. Generally speaking, Baul Fakirs are a community of folk spiritual practitioners from Bangladesh (East and West Bengal). Opposed to caste systems and religious rituals, these practitioners are rebellious, worldly, body-oriented, humanist, and materialist. They are propagators of humanistic philosophy and worshippers of 'rasa-rati' (the essence of love and passion). This spiritual practice is non-scriptural, folk-based, and orally transmitted, involving a form of conjugal yoga practice passed down through the guru-disciple lineage. In one sense, this practice is a pursuit of equality and friendship, and in another sense, it is the pursuit of the 'Man of the Heart.' The main goal of this practice is the realization of the Supreme Being, or the 'Man of the Heart,' through the dual 'form' of 'Prakriti-Purusha' (Nature and the Supreme Being). Human life is of utmost importance to the Baul Fakirs. This spiritual practice begins with desire. Only after conquering desire does the practice begin through the pursuit of love. According to Baul Fakirs, the human body is a microcosm of the universe. The universe resides within the body's vessel. The Supreme Being resides within the human body, whom the Baul Fakirs call the 'Man of the Heart.' He can be attained through human love. This Supreme Being can be attained only by transcending from 'form' consciousness to 'essential' consciousness. Baul Fakirs spend their entire lives in search of this being. The writer Dhananjay Ghoshal is known as one of the prominent poets, storytellers, and playwrights of our time. He is a well-known name in the world of radio plays. His book 'Achin Pakhi O Onyanya Galpo' (The Unknown Bird and Other Stories) depicts the lives of Baul Fakirs. He realistically portrays the various joys and sorrows of their lives, as well as the diverse impacts of their joyful and painful experiences. The stories primarily focus on the lives of Baul Fakirs from Rangamati in Birbhum, West Bengal. These stories feature various themes, including a foreign woman who is a devotee of Baul music, someone who aspires to be a Baul but fails, a disciple's devotion and dedication to their

guru, and contrasting perspectives on life, including one filled with greed and worldly desires. On one hand, the stories are captivating and enjoyable due to their portrayal of the diverse life styles of Baul fakirs and their unique philosophy and spiritual practices; on the other hand, they are also rendered beautifully and realistically through the brushstrokes of reality.

Discussion

বাউল ফকির বাঙালির ভাব-জীবনের সম্পদ। 'বাউল' শব্দের অর্থ যেমন অনির্দিষ্ট, তেমনি আবার বহু বিস্তৃত। বাউল ফকিরদের আছে নানা ভাগ, নানা বিভাগ। বাউল ফকির কোনো ধর্ম নয়, তা এক ধরনের সাধনা। আসলে তা এক যাপন, এক আনন্দমার্গের সাধন। সাধারণভাবে বলা যায়, বাউল ফকির হল বাংলাদেশের এক শ্রেণির লোকায়ত ভাবজীবী সাধক সম্প্রদায়। জাতপাত ও শাস্ত্রাচার বিরোধী, প্রতিবাদী, মানবতাবাদী, ইহবাদী, দেহবাদী, বস্তুবাদী এই সাধকেরা মানুষতত্ত্বের প্রচারক, রস-রতির উপাসক। এ সাধনা অশাস্ত্রীয়, লৌকিক, মৌখিক ধারায় গুরু পথ বাহিত মিথুনাত্মক যোগ-সাধনা। বাউল ফকির সাধনা এক মিশ্র সাধন-পন্থা। মূলত বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া ও সুফি সাধনার মিলন-মিশ্রণে এটি জাত। গান তাঁদের সাধনার প্রধান অঙ্গ। এ সাধনা এক অর্থে মৈত্রীর সাধনা, সাম্যেরও সাধনা। তবে এ সাধনা আসলে 'মনের মানুষ'-এর সাধনা। প্রকৃতি-পুরুষের যুগল রূপ-সাধনার মধ্য দিয়ে পরম পুরুষের বা 'মনের মানুষ'-এর উপলব্ধিই হল এ সাধনার প্রধান লক্ষ্য। তবে এ সাধনা বড় কঠিন। যৌন-সন্তোষ নয়, যৌন-সংযমের মধ্য দিয়ে কামকে প্রেমে রূপান্তরিত করে সেই প্রেমের মাধ্যমে এ সাধনা করতে হয়। বাউল ফকিরদের সাধনা তাই এক অর্থে প্রেমেরও সাধনা। আর এ প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ হল মানব প্রেম। মানব জীবনই তাঁদের সাধনার বস্তু। মানব জন্ম বাউল ফকিরদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের সাধনা এক অর্থে মানব জীবনেরও সাধনা। অর্থাৎ জীবনের মধ্য দিয়ে প্রেমের সাধনা আর প্রেমের মধ্য দিয়ে 'মনের মানুষ'-এর সাধনা। এ সাধনার শুরুতে আছে কাম। কাম জয়ী হলে তবেই প্রেমের সাধনা শুরু হয়। আর প্রেমের সাধনা শুরু হলেই 'অধর মানুষ'-এর দর্শন লাভ সম্ভব হয়।

বাউল ফকিরেরা বিশ্বাস করেন, মানব দেহই বিশ্ব-দেহের প্রতিক্রম। দেহ ভাঙেই আছে ব্রহ্মাণ্ড। এই মানব দেহেই বাস করেন পরম পুরুষ। বাউলের ভাষায় যা 'মনের মানুষ'। তাঁকে পাওয়ার জন্য তাই মন্দির-মসজিদ, তীর্থ, শাস্ত্র, পূজা, আচার-বিচারের কোনো প্রয়োজন নেই। একমাত্র মানব প্রেমের দ্বারা মানুষ ভজনার মধ্য দিয়েই তাঁকে লাভ করা যায়। 'রূপ' চেতনা থেকে 'স্বরূপ' চেতনায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই 'অধর মানুষ'কে ধরা যায়। আর এই 'অধর মানুষ' লাভই বাউল ফকিরদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তাঁদের সারা জীবন কেটে যায় এই মানুষেরই সন্ধানে। শাস্ত্রাচারহীনতা, বৈষম্যহীনতা, উদার মতাদর্শ, সাম্য-মৈত্রী ও সমন্বয়ের সাধনা এবং 'মনের মানুষ'-এর সন্ধান বাউল সাধনার বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বাউল কোনো অর্বাচীন মত নয়। চৈতন্যোত্তর কালে (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রি.) আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এ মতের উদ্ভব ও পরবর্তী শতাব্দীতে এর বিকাশ ও প্রসার ঘটেছিল বলে অনেক বাউল বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন। তবে এ নিয়ে নানা মত পার্থক্য আছে।

সাহিত্যিক ধনঞ্জয় ঘোষাল (১৯৬৭-২০২৪) এ সময়ের একজন অন্যতম কবি, কথাকার এবং নাট্যকার। শ্রুতি নাটকের জগতে তিনি এক পরিচিত নাম। শুধু তাই নয়, স্বনামধন্য 'বলাকা' পত্রিকার তিনি কর্ণধার এবং সম্পাদকও। বর্তমান কালের তিলোত্তমা মজুমদার, সোহরাব হোসেন (বর্তমানে মৃত), শরদিন্দু সাহা, ভগীরথ মিশ্র, দেবারতি মুখোপাধ্যায়, বিনোদ ঘোষাল, প্রচৈত গুপ্ত, সুবোধ সরকার প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকদের সমসাময়িক ধনঞ্জয় ঘোষাল আপন প্রতিভায় তাঁর সৃষ্টিক্ষেত্রে নিজস্বতা ও স্বতন্ত্রতার পরিচয় দিয়েছেন। 'তোমাকে মেঘের চিঠি', 'প্রথম যৌবন', 'তোমার বসন্ত দিনে', 'সী বীচ', 'প্রেম পরকীয়া', 'রবি মল্লার' প্রভৃতি কাব্য ও উপন্যাসের পাশাপাশি 'স্বাধীনতা মাতরম্', 'যে ভারত দ্বৈপায়নের', 'আরশি কথার আলাপ', 'স্বপ্ন ফেরির সংলাপ', 'আলোয় ফেরার ডানায়' প্রভৃতি বিখ্যাত সব শ্রুতিনাটক রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ধনঞ্জয় ঘোষালের ‘অচিন পাখি ও অন্যান্য গল্প’ (২০২৩) গ্রন্থের গল্পগুলিতে বাউল ফকিরদের বিচিত্র জীবনকথা ধরা পড়েছে। তাঁর দীর্ঘদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও নানা সাধুসঙ্গের কারণে বাউল ফকির চরিত্রগুলি যেমন মাটি-ঘেঁষা, বাস্তবধর্মী ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে, তেমনি সহজ সরল সাধারণ মানুষের মতো করেই তাঁদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাময় জীবন কাহিনিকেও তুলে ধরেছেন। তবে কোথাও কোথাও তাঁদের দর্শন ও সাধনতত্ত্বের পরিচয়ও উঠে এসেছে। গল্পগুলিতে মূলত পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের রাঙামাটির বাউল ফকিরদের কথাই তুলে ধরা হয়েছে। তবে কোনো গল্পে বাউল অনুরাগী বিদেশিনী নারীর কথা (‘আলখাল্লা ও একতারা’) যেমন আছে, তেমনি কোথাও আবার বাউল হতে চাওয়া অথচ হতে না-পারা মানুষের কথাও (‘কীর্তনীয়া’) আছে। কোথাও শিষ্যের গুরুভক্তি, কর্তব্য-নিষ্ঠার কথা (‘দয়াল’, ‘কীর্তনীয়া’) যেমন আছে, তেমনি আছে ভিন্ন জীবন-বোধ ও লোভ-লালসাপূর্ণ জীবনের কথাও (‘রাঙামাটি’, ‘দেহতত্ত্ব’)। আবার কোথাও আছে বাউলের মাটি-ঘেঁষা জীবনের কথাও (‘মাটির দোতারা’)। তাঁর গল্পগুলিতে মূলত বীরভূমের রাঙামাটির বাউল ফকিরদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা, লোভ-লালসাময় ব্যক্তিগত জীবনের নানা তরঙ্গ-ভঙ্গকে নিজস্ব অভিজ্ঞতায়, বাস্তবের তুলিতে মরমি শিল্পীর মতো তুলে ধরেছেন। গল্পগুলিতে আছে মাটির গন্ধ, বাস্তবের স্বাণ। গল্পের চরিত্রগুলি যেন আমাদের কতকালের চেনা। তাঁদের জীবনের নানা উত্থান-পতন আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই। তাঁদের মাটি-ঘেঁষা জীবন কাহিনি লেখকের রচনা কৌশলে ও বাস্তবতার ছোঁয়ায় গল্পে এক অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। একদিকে বাউল ফকিরদের বিচিত্রধর্মী জীবন-কাহিনি, অন্যদিকে তাঁদের দর্শন ও সাধনতত্ত্বের পরিচয়ে ধনঞ্জয় ঘোষালের গল্পগুলি চিত্তাকর্ষক ও পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

(ক)

‘রাঙামাটি’ গল্পটি মূলত পবন ফকিরের জীবনের গল্প। এর সঙ্গে আছে বাউলের লোভ-লালসা পূর্ণ জীবনের কথা এবং চম্পা দাসীর মতো এক লোভাতুর নারীর জীবনে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক করুণ কাহিনি। পবন ফকির প্রতিদিন সকালে নিতাই আর কুঞ্জকে সঙ্গে নিয়ে আমার কুটিরের গাছ তলায় গান গাইতে হাজির হয়। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তাঁরা গান করে। পবন গাবগুলিতে সুর তোলে, নিতাই খোল বাজায় আর অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র নিয়ে তাল দেয় কুঞ্জ। কলকাতা থেকে ঘুরতে আসা বাবুরাই তাঁদের শ্রোতা। মাধাইয়ের চায়ের দোকানে তাঁরা চা-অমলেট খান। ছোট বেঞ্চিতে বসে চায়ের গ্লাসে চুমুক দেন আর পবনের দিকে তাকিয়ে লালনের গান শোনেন। শ্রোতার তাল দিয়ে কখনো একাত্ম হয়ে যান পবনের গানে। আর খুশি হয়ে দশ-পঞ্চাশ-একশো টাকা রেখে যান পবনের সামনে। যা আয় হয় তাতেই কুলিয়ে যায় তাঁদের তিনজনের ভাঙা সংসার। ভাঙাই বটে! পবনের এক সময় সংসার ছিল। এখন নেই। চম্পা দাসী চলে যাওয়ার পর সে এখন একা। নিতাই অবশ্য দুটো বাচ্চা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে থাকে আর কুঞ্জ এখন প্রৌঢ়। তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে অনেক আগেই। তাঁর তিন ছেলে বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা-পয়সা ভাগাভাগি করে তাঁকে একলা ফেলেই দূরে চলে গেছে। ছোট ছেলেটা অবশ্য দু-চারজনকে নিয়ে মাঝে মাঝে নিজের কাজে আসে। সে এখন রাজনীতি করে। এ হেন কুঞ্জের গতি এখন পবন। আগে সে ছিল বিশু বাউলের দলে। কিন্তু বিশু কলকাতা চিনেছে। তাই গাঁয়ের গায়ন-বায়নদের বিদায় দিয়ে শহরে গিয়ে গানের ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। বিশু চলে যাওয়ায় কুঞ্জ পবনের আঁখড়ায় এসে জুটেছে। এদিকে আবার চম্পা দাসী পবনকে ছেড়ে বিশ্বর সঙ্গে চিরকালের জন্য চলে গেছে। সে প্রসঙ্গ উঠলেই নিতাই রেগে গিয়ে বলে যে, ও আবার দাসী হল কবে? পবনের সঙ্গে থাকত – এই পর্যন্ত। পবন কোনো উত্তর দিতে পারে না। কুঞ্জ খানিকটা লজ্জা পায়।

“এদের মনেও চম্পার চলে যাওয়ার দুঃখ জেগে ওঠে, পবন বুঝতে পারে। প্রসঙ্গ এগিয়ে যায়। তবু নিতাই কিছুতেই সেখান থেকে সরে আসতে পারে না। চম্পার ওপর রাগে ফুঁসতে থাকে, ফুঁসবে নাই বা কেন? চোখের সামনে নিতাই দেখেছে কীভাবে চম্পা পবন ফকিরকে শুষে নিয়েছে, যোগান ঠিকমতো না হলে হয় করেছে। শুধু চাই আর চাই।”

পবন আর বিশু একসময় দুবরাজপুরে সাধন ক্ষ্যাপার আশ্রমে সাধন-ভজন শিখত। পরে গুরু তাঁদের আখড়া খোলার নির্দেশ দিলে প্রথমে বিশু, পরে পবন আখড়া খোলে। আখড়া খুলে জয়দেবের মেলায় পরপর পাঁচবার গিয়ে বিশু স্থায়ীভাবে কলকাতা যাওয়ার পাকা ব্যবস্থা করে ফেলে আর কলকাতা থেকে তাঁর নামে গানের ক্যাসেটও বের করে। ইতিমধ্যে সে কলকাতায় এক বড় বায়না পায়। তাঁকে আরো কিছু বাউল ফকির নিয়ে যাবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কারণ সারারাত বাউল গানের আসর সে একা চালাতে পারবে না। তাছাড়া নামের তালিকায় সবাই বাউল হলে অনুষ্ঠান হবে একঘেঁয়ে। ফকির-ক্ষ্যাপা ইত্যাদি হলে আসর বেশ জমে যাবে। সেজন্য সে গুরুদেবকে জানিয়েছিল। কিন্তু গুরুদেব রাজি না হওয়ায় বিশু পবনের কাছে আসে। পবনও রাজি না হওয়ায় বিশু বোঝাতে চায়, কলকাতায় যাওয়ার প্রয়োজন আছে।

“সাধন-ভজন আখড়ায় যা হয়েছে তা অনেক। যুগ পালটেছে। বাউল গান গেয়ে কত লোক ধনী হয়ে গেল, আর বাউলের সংসারে হাঁড়ি চড়ল না। এখন যদি সুযোগ আসে, তবে বাউল নিজেই ধনী হয়ে যাক।”^২

বিশু আসলে গানকে পণ্য করে, সাধনাকে বিক্রি করে বাজারে চড়া দামে চড়িয়ে ধনী হতে চায়। বড়লোক হওয়ার ইচ্ছা তাঁর মনে জাগে। সে সুখ পেতে চায়, অর্থ ও যশ পেতে চায়। কিন্তু পবন জানে, ধনী হলে আর গান হয় না। দুঃখের উৎস ধারা বন্ধ হলে গান হয়ে যায় মেকি, নিছক বিনোদন মাত্র। গান গাওয়াটাই তো শুধু সাধনা নয়, গান গাইলেই তো বাউল হওয়া যায় না। তার জন্য সাধনা দরকার। পবন তো কেবল গান গায় না, গানও লেখে। সে কেবল গায়ক নয়; সে স্রষ্টা, সুরকার, শিল্পীও। তাঁর সাধনা-লব্ধ ধনকে পণ্য করে বাজারে চড়া দামে কড়ির বিনিময়ে বিক্রি করতে চায় না। তাতে তাঁর অভাব থাক আর যাক। তাই বিশুর দেওয়া আসা-যাওয়া, খাওয়া-থাকা, নগদ টাকা, প্রচার, ছবি-বিজ্ঞাপন ইত্যাদির প্রলোভন এড়িয়ে যায়। কলকাতার ডাক তো তাঁরও এসেছিল। এসেছিল ক্যাসেট করার সুযোগও। কিন্তু সে রাজি হয়নি। আমার কুটিরের বেদীর ওপর বসেই সে যে কলকাতাকে দেখতে পায়! তবে তাঁর কলকাতা যাওয়ার প্রয়োজনই বা কী? কলকাতার কত বাবু তাঁর গান আর নাচ দেখে তাঁকে বায়না করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে যায়নি। কলকাতার কত নামি-দামি ক্লাবের হর্তাকর্তার দল তাঁর গান শুনে গেছেন। সে তাঁদের সঙ্গে আহা-বিহার, এমনকি নেশাও করেছে। কতজন তাঁকে ভিজিটিং কার্ড দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পবন সেসব রাখেনি। কতজন মোবাইল উপহার দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে সেসব নেয়নি। হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। তাই বিশুকে পবন জানায়, কলকাতার দরকার হলে তাঁর কাছে আসবে। সে কিছুতেই সেখানে যাবে না। কিন্তু লোভী বিশু এখন আর মাঠে-ঘাটে গান করে বেড়ানোকে ভালো চোখে দেখে না, অশ্রদ্ধা করে। তাই লোভনীয় বায়না পেয়েই সে কলকাতা চলে যেতে চায়। কিন্তু পবন তো রাজি নয়। তাই শেষপর্যন্ত সে চম্পা দাসীকে নিয়ে যেতে চায়। পবনের অনুমতি পেলে চম্পা বিশুর সঙ্গে কলকাতায় নানা অনুষ্ঠান, প্রচার ও বিজ্ঞাপনে মেতে ওঠে। বারবার আসা-যাওয়ার অসুবিধায় শেষ দিকে চম্পা কলকাতাতেই থাকত। মাঝে মাঝে ফিরে এসে পবনকে কলকাতার গল্প শোনাত। তবে একটা সময়ের পর সে আর ফিরে আসেনি। পবনও তার কারণ জানত। জয়দেবের বাউল মেলাতেও তার খোঁজ করে পায়নি পবন। কেবল বিশুর বিদেশ যাত্রার খবর পবন শুনেছিল। চম্পা ফিরে না আসায় পবনের মনে দুঃখ হত, কষ্ট হত। মনে মনে দুঃখ ভরা মনে কথা খুঁজে না পেয়ে তাঁর মনে পড়ে যেত গানের লাইন। সে গাইত, -

“রইল খাঁচা, উড়ল পাখি
ছুটি দিলেম তোকে
খাঁচার ভিতর পাখির ছায়া
রইল একা শোকে।”^৩

এই শোকই তাঁর জীবনে চিরস্থায়ী হয়েছিল। সে শেষবারের মতো চম্পাকে ফিরে পেয়েছিল আমার কুটিরের রাঙা প্রান্তরে। কিন্তু চম্পার জীবনের সেই মর্মান্তিক পরিণতি সে প্রত্যাশা করেনি। বাদলের দিনে ভিজতে ভিজতে পবন আমার কুটিরের বেদী প্রাঙ্গনে হাজির হলে একদল পতিতা একজন নারীকে দাহ করতে নিয়ে এসেছে দেখতে পায়। কিন্তু তার

মুখাঙ্গি করার মতো পুরুষ কেউ নেই। জানতে পারে তাকে দালাল বিক্রি করে দেওয়ায় পতিতালয়ে একমাস হল এসেছিল। বগড়া হত, তাই টিকতে না পেয়েই বোধহয় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। যদিও প্রকৃত কারণ তারা কেউই জানে না। সব শুনে পবন পাটকাঠি ধরিয়ে মুখাঙ্গি করতে এগিয়ে যায় আর পুরুত মন্ত্র পড়ে। কিন্তু মুখের কাপড় সরাতেই নিতাই চিৎকার করে ওঠে আর পবন মুখের কাছে জ্বলন্ত পাটকাঠি ধরেই থাকে।

“তার হাত নড়ছে না, মুখ সরছে না। শুধু নিখর স্তব্ধ সরু মুখের চম্পার দিকে তাকিয়ে আছে।”^৪

চম্পার এই বিষাদান্ত পরিণতি পবনকে পাথর করে দেয়। এই অপ্ৰত্যাশিত মর্মান্তিক দৃশ্যে তার অন্তরাত্তা যেন কেঁদে ওঠে। পরম মমতায় লেখক চম্পা দাসীর জীবনের করুণ পরিণতি তুলে ধরে বাউলের দেহ-সাধনার অন্তরালে চলতে থাকা নারী পাচার চক্র ও লোভাতুর জীবনের শেষ পরিণতি যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি তাঁদের সুখ-দুঃখময় জীবনেরও পরিচয় দিয়েছেন।

(খ)

‘কীর্তনীয়া’ গল্পে সরাসরি বাউল জীবন কথা না থাকলেও বাদল নামধারী এক কীর্তনীয়ার জীবন কথা ও করুণ পরিণতি স্থান পেয়েছে। গল্পটিতে বাউলের কিছু প্রসঙ্গ ও অনুসঙ্গ বাদলের জীবন কাহিনির সূত্রে উঠে এসেছে মাত্র; বাউল সাধকের জীবন বা তত্ত্বকথা এখানে সেভাবে নেই। বিশু কীর্তনীয়ার শিষ্য “বাদল পেশায় ঘরামি। নেশায় বাউল। বাউলের তত্ত্ব বা জ্ঞান কিছুই তার জানা নেই। জানার সুযোগ হয়নি। বিশু কীর্তনীয়ার কাছে কিছু পালার তালিম পেয়েছিল এই যা। জগাই-মাধাই অথবা কাজি উদ্ধারের মতো আড়াই ঘন্টার পালা অনায়াসেই নামিয়ে দিতে পারে। কথা ও ব্যাখ্যার সঙ্গে গান। ভক্তিতে গদগদ শ্রোতৃমণ্ডলী বাদলের দিকে চেয়ে থাকে অপলক।”^৫

এই বাদলের জীবন বড় করুণ। বাদলেরা তিন ভাই ছিল পিঠোপিঠি। বাদল ছোট। বোনটা তাঁর পরে। তাঁর বড় ও মেজো ভাই অল্প বয়সে অপঘাতে মারা যায়। বড় ভাই সর্পাঘাতে আর মেজো ভাই রোড অ্যাক্সিডেন্টে। বাদলের বাবা তখন থেকেই ছিল মন মরা। আর তাঁর মা বাদলকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিল মন্দিরে মন্দিরে। বাদলকে বাঁচাতেই হবে। গণৎকার বলেছিলেন ছেলেটাকে সরিয়ে দিতে। না হলে এরও অপঘাতে মৃত্যু অনিবার্য। মায়ের মন বাপের বাড়ি রেখে আসতে চেয়েছিল বাদলকে। কিন্তু তার মামারা সংস্কারবশত নিজেদের ছেলেমেয়ের কথা ভেবে বাদলকে রাখতে চায়নি। তাই ভেজা চোখে তাঁর মাকে ফিরে আসতে হয়েছিল। এমন এক সময়ে বিশু বসিরহাটের ময়রাপাড়ায় বাদলদের গ্রামে কীর্তন গাইতে গিয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষে সবার মতো বাদলের মা তাঁকে প্রণাম করতে আসে কিন্তু আর ওঠে না। শেষে বোঝা যায়, তিনি মারা গেছেন। বিশু অপ্রস্তুত, লজ্জিত। তাঁর পায়ে মাথা দিয়ে এমন মরণ দেখতে হল তাঁকে? প্রশ্নটা বারবারই তাঁর মনে অপরাধবোধ বয়ে আনে। ভেবে পায় না সে কী করবে? এদিকে বাদল মায়ের বুকের ওপর মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। মৃত্যু বিষয়টা দশ-বারো বছরের ছেলেটার তেমনভাবে জানার কথা নয়। কিন্তু বড় দুই ভাইয়ের চিরকালের চলে যাওয়া ওইটুকু ছেলেটার মনে মৃত্যুর একটা সংজ্ঞা তৈরি করে দিয়েছিল। গ্রামবাসীদের মুখে বাদলের মায়ের ইচ্ছার কথা শুনে বিশু বাদলকে নিজের আখড়ায় নিয়ে এসেছিল এবং কীর্তন গানের তালিম দিয়ে তারই শিষ্য করে নিয়েছিল। সেই থেকে বাদল বিশ্বর কাছেই থাকে। তাঁর পদবি দাস হলেও বাদল নিজে সে পদবি বাদ দিয়ে বৈরাগী হয়ে উঠেছিল। সে নিজেকে বাউলের মতো ধুতি আর আলখাল্লাতেই সাজিয়ে রাখতে ভালোবাসে। গুরু তাঁকে বলতেন ওসব সেজে কী লাভ? সে তো আর বাউল নয়। বাদল কোনো উত্তর দিতে পারত না। তবুও মনে মনে নিজেকে বাউল ভাবার শখটা ভেতর থেকে তাড়াতে পারেনি। বৈরাগী পদবি, লম্বা চুল, আলখাল্লা আর একতারা নিয়েই তাঁর দিন কাটে। এ অঞ্চলে আর কোনো বাউল নেই। একদিন সে গুরুকে না বলেই জয়দেবে চলে গিয়েছিল আর চরণদাস বাউলের আখড়ায় উঠেছিল। বিশ্বর নাম শুনে চরণদাস তাকে কীর্তন সম্রাট বললে গর্বে তাঁর বুক ভরে যায়। কীর্তন বাদলকে টানে আর বাদল টানে বাউলকে। কিন্তু কেন বাউলের দিকে তাঁর মন, চরণদাসের সেই প্রশ্নের উত্তর সে দিতে পারেনি।

“তার সাজগোজ বাউলের মতো, কিন্তু তার বাউলের তত্ত্বালাশ জানা হয়নি, সাধুসঙ্গ করা হয়নি, সাধনা তো স্বপ্নের অতীত।”^৬

এমনতরো বাউলের বেশভূষায় পাড়ায় তাঁকে নানা টিটকারি শুনতে হয়। ক্লাবের ছেলেরা তাঁকে বলে ‘ড্রেসিং বাউল’। বাদল জানে, তাঁকে সাধনা শিখতে হবে। কীর্তন যা শিখেছে থাক। এখন তাঁর সাধনা দরকার। সাধন-সঙ্গিনী প্রয়োজন। কিন্তু গুরু তাঁকে বলেন যে, ওসব করে লাভ নেই। ঘরামির কাজ করেই সে সারা বছর খেতে পাবে। আর তার কাছে শেখা দু-একটা পালা গাইলেই চলে যাবে। ওসব তন্ত্রে-মন্ত্রে যাবার দরকার কী? তাই জয়দেব থেকে ফিরে এসে একটু একটু করে বাউলের পোশাক খসিয়ে দিয়েছে। বুঝতে পেরেছে, বাউল আসলে একটা স্তর। তাঁর গুরুর কত নাম-ডাক-খ্যাতি। তিনি কীর্তন সম্রাট অথচ তাঁর কোনো অহংকার নেই। এই অবস্থাই তো বাউল। তাই বাদল এখন কীর্তনে মন দিয়েছে। গুরুর অবর্তমানে কলকাতায় সে কীর্তনের একটা বায়না পায়। সেজন্য রাতে উত্তেজনায় তাঁর ভালো ঘুম হয় না। এদিকে রতন পাশা তার গৃহ-প্রবেশের জন্য পুজোর দিন ঠিক করে রেখেছে। তাই শহরে যাওয়ার আগেই তার ঘরটাকে টালি দিয়ে ছাইয়ে দিতে হবে। সেজন্য সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে সহকর্মী মাধবদাসকে ডাক দিয়ে বাদল রতনের ঘর ছাইতে যায়। চালে উঠে পাশে প্রকাশ গাইনের দোকানঘর থেকে অন্যরকম একটা আওয়াজ শুনতে পায়। কৌতূহলবশে দুটো টালি ফাঁক করে দেখে, তিনজন ছেলে একটি মেয়েকে নগ্ন করে ধর্ষণ করেছে। সংজ্ঞাহীন মেয়েটি মাটিতে শুয়ে আছে। মুখে তার অন্তর্বাসের কাপড় গোঁজা। মুখ ঢাকা ছেলে তিনটি তাঁকে দেখে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেড়িয়ে যায়। রাগে উত্তেজনায় বাদল হাতের দা-টা তাদের দিকে ছুঁড়ে দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা মেয়েটির পেটের ওপর পড়ে দা-এর কোপ বসে যায়। আর বাদল চেষ্টা করে তাড়াতাড়ি নামার সময় চালে বাঁশের ফোঁকরে পা ঢুকে যাওয়ায় টালির গাদায় পড়ে যায়। মাথায় আঘাতের জন্য অজ্ঞান হয়ে পড়ে। মাধব জল দিয়েও জ্ঞান ফেরাতে পারে না। শেষমেশ বাদল মারা যায়। সুযোগ বুঝে রাজনৈতিক নেতাদের চেলা এই ধর্ষক ছেলেগুলো তাঁর নামে মিথ্যা ধর্ষণের মামলা রটিয়ে দেয়। তাঁর আখড়া জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে পরিচয়হীন মেয়েটির কোনো তদন্ত ছাড়াই তাকে দাহ করে দেওয়া হয়। যে মেয়েটি আসলে বাদলেরই বোন। বাবার অসুখের খবর নিয়ে সে দাদার কাছে গত রাতে আসছিল। কিন্তু তিনটি যুবক তাকে আখড়ায় নিয়ে যাওয়ার নাম করে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে এবং মুখে অন্তর্বাস গুঁজে হত্যা করে। গল্পটিতে বাদল ও তাঁর বোনের করুণ পরিণতির পাশাপাশি মানুষের মধ্যে পশুত্বকামী ও ব্যভিচারী মনোভাবের প্রকাশ যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি রাজনীতির প্রশ্নে মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করে নির্দোষীকে দোষী প্রমাণিত করে সত্যের অবলুপ্তি ঘটানোর চেষ্টাও দেখানো হয়েছে। এরই সঙ্গে রাজনীতির কদাচার দিকটিও সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

(গ)

‘দয়াল’ গল্পে বাউল দয়ালের ব্যক্তিগত জীবনকথা, তার সাধন-ভজন, বেড়ে ওঠা, সর্বোপরি তার ‘বাউল’ হয়ে ওঠার কথা অপরূপ ভঙ্গিতে ধরা পড়েছে। দয়াল ও তাঁর গুরু চারণদাস বাউলের জীবন কথাই মূলত এখানে উঠে এসেছে। যুবক দয়ালের চোখ দুটো ভারী অন্ধুত। চোখের ভিতর আগুন আছে। সে আগুনের সামনে দাঁড়ালে মনটা পুড়ে শুদ্ধ হয়। তাঁর ভারী কণ্ঠ, দোমড়ানো মোচড়ানো গালের ওপর সাধের দাড়ি একেবারে বাউল বৈরাগীর মতো। তাই পাশের বাড়ির হরিহর কাকা তাঁকে বাউল হতে বলেছিলেন। দয়াল তো আসলে বাউলদেরই মতো বন্ধন মুক্ত, বিরাগী। তাঁর নিজের বলতে কেউ নেই। মা-বাবা নেই, ঠাকুরমাও নেই। সংসারে সে একা। মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত দয়ালের ঠাকুরমা যতদিন ছিলেন, ততদিন ভিটেটার প্রতি একটা টান ছিল তাঁর। ঠাকুরমা গত হওয়ার পর বাড়িতে এক দণ্ডও মন টেকে না তাঁর। এক অলীক শূন্যতা যেন গ্রাস করে তাঁর পায়ের তলার মাটি। বাবা-মা না থাকায় তাঁর বেশি দূর পড়াশোনা হয়নি। বাবার সঞ্চিত যা ছিল, তা দিয়েই দশ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিল। ঠাকুরমা পেনশন পেতেন। তাঁর ঠাকুরদা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। ঠাকুরমা মারা যাওয়ায় যখন সে পেনশন বন্ধ হল, তখন দয়াল হরিহরের বড় ছেলের সঙ্গে আনাজপাতির দোকান খুলে ব্যবসা শুরু করে। ক’দিন ব্যবসা বন্ধ রেখে সে জয়দেবের মেলায় যায় এবং চারণদাস বাউলের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে জানায় যে, সে গান শিখতে চায়। চারণদাস জানিয়েছিল, তাঁর আখড়ায় চলে যেতে। সেখানে থাকবে, খাবে, গান শিখবে, চাষাবাদ

করবে আর মাঝে মাঝে একতারা নিয়ে গান গেয়ে শিক্ষা করবে। তারপর মেলা থেকে ফিরে সে তাঁর ব্যবসার সব কিছু করি হরিহরের ছেলেকে দিয়ে দেয়। এমনকি ঘরটাও দিয়ে দেয়। বলে সে গান লিখবে, গান গাইবে। তারপর ট্রেনে চড়ে চারণদাসের আখড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। আর স্বপ্নে বিভোর হয়ে ভাবে তাঁর গান শুনে সবাই তাঁকে বাহবা দেবে। একদিন সে বিখ্যাত হয়ে যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। যে আখড়ায় দয়াল যাচ্ছে, সেটিও চারণের নিজের আখড়া নয়, তাঁর গুরু। গুরু চারণকে দিয়ে গিয়েছিলেন। চারণের গুরু ছিলেন একাধারে বাউল ও তান্ত্রিক। শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়াতেন। শেষে ভক্তদের অনুরোধে ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে গ্রামের এক কোণে আখড়া খুলে বসেছিলেন। চারণের গুরু ছিলেন মুসলমান ফকির আনন্দদাস। নাম শুনে চারণ প্রথমে বুঝে উঠতে পারেনি যে, তাঁর গুরু মুসলমান ফকির। ধর্মের কোনো আচার ও বিধান তিনি মানতেন না। চারণকে একদিন ডেকে বলেছিলেন, -

“...দেখ আনন্দ গ্রহণ আর আনন্দ দানই জীবনে সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। তাই আনন্দদাস নামই নিয়েছি।”^৭

আনন্দদাসের এই আখড়ায় চারণ এসেছিল একদিন দয়ালেরই মতো। চাষবাস করত, সন্ধ্যায় গান শিখত আর সকালে শিক্ষায় যেত। তারপর একদিন আনন্দদাস তার হাতে আখড়ার সমস্ত দায়িত্ব তুলে দিয়ে কোথায় যে চলে গেলেন, চারণ বিভিন্ন মেলায় ঘুরেও তার কোনো সন্ধান পায়নি। অবশেষে দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সেও শিষ্যদের সঙ্গে আটকা পড়ল। বাড়ি ফেরা আর হল না। একদিন রাগের মাথায় সে বাড়ি ছেড়েছিল। ট্রেনে চড়ে নিরুদ্দেশ হবার সময় আনন্দদাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর সম্মোহনী বিদ্যায় আটকা পড়ে চারণদাস বাউল হয়ে গেল। আনন্দদাস যুবতী বোষ্টমীর সঙ্গে চারণকে নিয়ে আখড়ায় উঠেছিলেন। তারপর আজ তিরিশ-চল্লিশ বছর সে বাড়ি ছাড়া। বোষ্টমীর সঙ্গে গুরুর সম্পর্ক প্রথম প্রথম তাঁকে ভাবিয়ে তুলত। তারপর বহুদিন কেটে গেলে একদিন আনন্দদাস চারণকে বললেন, এবার তার নিজের আখড়া প্রয়োজন। তাঁর নিজের আখড়ার দায়িত্ব চারণকে দিয়ে বললেন, এবার তাঁকে ছেড়ে দিতে। এখানে তাঁকে আর কুলিয়ে উঠবে না। তাঁর গুরুদেব সাধনার কোনো পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন যে, চার দেওয়ালের এখন আর প্রয়োজন নেই, বিশ্ব চরাচরই তাঁর আখড়া! তবে শুধু আখড়া নয়, নিজের বোষ্টমীকেও তার হাতে তুলে দেন আনন্দদাস। যে আসলে ছিল তাঁর কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে। সকালে উঠে চারণদাস দেখে, সবই আছে, কেবল একতারা নিয়ে গুরুদেব নিরুদ্দেশ হয়েছেন। রেখে গেছেন তাঁর গানের খাতা আর সঞ্চিত অর্থ। তারপর তিনি আর কোনোদিন ফিরে আসেননি। তাতে অবশ্য চারণের দুঃখ নেই। দয়ালের ভিতর দিয়ে সে যেন তাঁর গুরুকে ফিরে পেয়েছে। তাই দয়ালকে সে বলেছে, বাউল বংশ-পরম্পরা নয়, গুরু-পরম্পরা। চারণের আখড়ায় এসে দয়ালের মন বড় বেশি গৈরিক হয়ে গেছে। দোতারায় হাত পাকিয়েছে ভালোই। গানের মেজাজ বুঝে গায়কী চং আয়ত্ত্ব করেছে। তবে দয়াল এখন কেবল গানই গায় না, আনন্দদাসের লেখা গানে সুরও দেয়। আবার নিজেও গান লেখে। চারণ বুঝতে পারে, এই কটা বছরেই দয়াল তাঁকে ছাড়িয়ে গেছে। এখানে আর তাঁকে কুলাবে না। তাঁর এখন নতুন আখড়া দরকার আর দরকার একজন সাধন-সঙ্গিনী। বাউল তো যুগল সাধনা। তাই সে দয়ালের জন্য মেয়ে দেখে আর কণ্ঠ বদলের আগে তাঁকে একবার দেশ থেকে ঘুরে আসতে বলে। দয়ালের মনে পড়ে যায়, তাঁর তো সেখানে কেউ নেই। কেউ কি তাঁকে চিনতে পারবে? তবু একবার গেলে ভালোই হয়। বৈষ্ণবীর সঙ্গে কণ্ঠ বদলের পর তাকে নিয়ে দয়াল দেশে ফিরে যায়। নিজের ঘরে প্রবেশ করে পুরানো স্মৃতি একটু একটু করে মনে পড়ে। হরিহরের মেয়ে মিলুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে মিলু তাঁকে বলে যে, তুমি বিয়ে করে নিলে দয়ালদা! আমি না অপেক্ষায় ছিলাম, বুঝতে পারিনি! দয়াল কী বলবে, ভেবে পায় না। সে আজ বাউল। প্রেম প্রত্যাখান তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। নারী মানেই কি প্রেম? ফকির আনন্দদাসের ছবিটা ভেসে ওঠে। ভেসে ওঠে গুরু চারণের মুখ। চারণদাসও তাঁকে বিয়ের আগে দেশ থেকে ঘুরে আসতে বলেছিল। ইচ্ছা হয়নি দয়ালের। তখন যদি একবার ফিরত! দয়ালের বুক জুড়ে শূন্যতা। তাঁর খারাপ লাগে। মিলুকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, তাঁর শিষ্যা হতে। হেসে জানায়,

“...পাগলি, বিয়েতে কী আছে? শিষ্যা হলে অনেক কিছু পাবি। সুরের চেয়ে বড় সঙ্গী এ দুনিয়ায় আর কে আছে?”

দয়াল উড়ে গেল অসীম শূন্যতায় মিলু আর বোষ্টমীকে নিয়ে, যেখানে অনন্ত প্রেমের আনন্দে ফকির হয়ে নিজেকে ফুরিয়ে ফেলার ইচ্ছেটাই বড়। আর যা কিছু এ জীবনে প্রাপ্তি সবই তুচ্ছ, সবই খেলনার মতো নির্দিষ্ট বয়সের পর বাতিল।”^৮

(ঘ)

‘মাটির দোতারা’ গল্পটিতে বাউলের জীবন কথা, দর্শন, সাধনা ও বাউল বিষয়ক কিছু ভাবনার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। ‘মাটির দোতারা’ নামটি প্রতীকী। নামটি ব্যঞ্জনাবাহী। নামটির মধ্য দিয়ে প্রকৃতি-প্রেমী বাউলের লোকায়ত মন ও জীবন-সংস্কৃতির কথা এবং তার মাটি-ঘেঁষা জীবন তথা মাটির প্রতি তার টান, ভালোবাসার কথাই এখানে উঠে এসেছে। নামটির মধ্য দিয়ে বাউলের দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ অভাবী জীবনের কথাও হয়ত একই সঙ্গে ব্যঞ্জিত হয়েছে। সূক্ষ্ম কৌশলে হয়ত নাগরিক জীবন-সংস্কৃতি ও বৈভবের সঙ্গে গ্রামীণ সংস্কৃতির তুলনা করে উভয়ের পার্থক্য দেখিয়েছেন লেখক। দেখিয়েছেন, বাউল জীবন একান্তভাবেই মাটির জীবন। মাটি ছাড়া তার চলে না। মাটি ছাড়া হলেই তার জীবনের রস শুকিয়ে যায়, গান হয়ে পড়ে নীরস, শুষ্ক। তাছাড়া মাটির সঙ্গে বাউলের দোতারার এক গভীর সম্পর্কও এখানে ধরা পড়েছে। শুধু দোতারা থাকলেই হবে না, মাটিও চাই। না হলে বাউলের গানের গলা যে ঠিক মতো খোলে না! সুরের তরঙ্গ ঠিক মতো খেলে না। গল্পটির শুরু তাই মাটির কথা দিয়ে। মাটি এবং মন। মাটির রঙের সঙ্গে কি মনের কোনো সম্পর্ক আছে, এই প্রশ্নটা নিশি বাউলকে তাড়িয়ে বেড়ায়। বাউল রসের পাগল অথচ রসে বশে মদে জলে সে নেই। একেবারে শুকনো গাঁজায় বৃন্দ হয়ে থাকে। এ ভাবনা মাথায় এলে তাঁর মনে পড়ে, শহরে গেলে সব ব্যাটাই মদ খায়। সেখানে কঙ্কে জ্বালিয়ে গাঁজা খেয়ে দূষণ ছড়ালে চলে না। বাবুদের প্রেস্টিজ থাকে না। তাই মদ খেয়ে জড়াজড়ি করে বাড়ি ফেরো কিংবা পা হড়কে পড়ে যাও, - সাত খুন মাফ। নাগরিক জীবনের এই শৌখিনতাকে নিশি ব্যঙ্গ করে। তাঁর মনে হয়, সবই আদিখ্যেতা।

নিশি গায়ক বাউল। তাঁর কথা কেউ শুনুক বা না শুনুক, তাঁর গান না শুনে থাকবে, এমন হিম্মত নেই কারোর। তাঁর গায়ন-বায়নের দলও এ কথা জানে। বৈশাখের বর্ষবরণের সন্ধ্যায় নিশির কলকাতায় গানের ডাক পড়েছিল। আড়াই ঘন্টার প্রোগ্রাম ছিল। কেউ নড়েনি চড়েনি পর্যন্ত। ভিড় ক্রমশ বেড়েছে। গেরুয়া আলখাল্লা আর শেষে দেখা যাচ্ছিল না। দশ, পঞ্চাশ, একশো টাকার নোট সেফটি পিন দিয়ে আটকাতে আটকাতে আর জায়গা ছিল না। টাকা শরীর হয়ে গিয়েছিল তাঁর। মেজাজটাও জমে গিয়েছিল সাংঘাতিক। পরদিন আখড়ায় বসে ময়ূরাক্ষীর ওপারের ধূসর জনজীবনের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর মাথায় একটা ভাবনা উঠে আসে। মাটির রঙ লাল আর তাঁর পোশাকের রঙ গেরুয়া। তবে কি বাউলের মনে কোনো কামনা-বাসনা থাকতে নেই?

“বাউল তো বংশধারা অনুযায়ী চলে না। গুরু ধারায় বয়ে যায় সুর আর কথার ভিতর গোপনতত্ত্ব। নিশি বাউলের গুরু চির বৈরাগীকে দেখে তেমন বাসনা আছে মনে হয়নি। বাসনা নেই এই ধারণার জন্যই কি মনটা মাটির মতো মেটে হয়ে যায়?”^৯

নিশির তা জানা নেই। কলকাতায় এসে একটা সময় পর তাঁর মনটা আর কিছুতেই আত্মতত্ত্বের গানে ফিরছিল না। মাটি নেই বলে? সেজন্যই কি সে টবের গাছে মাটি খোঁজে আর ভাবে মনটাও কি পালটে যায় মাটির রঙের সঙ্গে সঙ্গে? চড়ায় গান ধরার জন্য কি মাটির একটা রঙ দরকার? মনে পড়ে, তাঁর অঞ্চলটা বাউল ফকিরের। সেখানে তেমন বৃষ্টি হয় না। অথচ বাউলেরা রসের রসিক। রক্ষ মাটির বাউলেরা তবে এত রসিক হয় কেন, প্রশ্নটা তাঁকে ভাবায়। তাঁর মনে হয়, আত্মতত্ত্বের গানের রসদ কি তবে এভাবেই আসে? নিশি জানে, কামনা-বাসনা থেকে নিবৃত্তির জন্যই তো তাঁর বাউল হওয়া। তাঁর ঘরে তিন প্রজন্মের বাউল। তাঁর ঠাকুরদা জয়দেব মেলায় এসেছিলেন আর বাড়ি ফিরে যাননি। তাঁরও রক্তে মিশে আছে বাউলতত্ত্ব আর অলীক কিছু ভাবনা।

নিশি জানে, তাঁরা বাউলেরা ও তাঁদের বাদ্যযন্ত্র— একতারা, দোতারা বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা বহনকারী। তাঁরা বাউলেরা বিদেশিদের উচ্ছিন্ন ভোগী, অনুকরণীয় গিটার ঝোলানো ‘মাল’ নয়। তবু তাঁদের সংস্কৃতি আজও সেভাবে

পয়সার মুখ দেখিনি। অথচ গিটার তাণ্ডবে অ্যাংব্যাং গেয়ে পয়সা লুটে নিচ্ছে একদল। যদিও তাঁর সঙ্গে গানে পাল্লা দেবার মতো জোর গিটারওয়ালাদের কারোর নেই। তবু তাঁর অভাব ঘোচে না। জয়দেব মেলার পর দু-এক মাস সেই টাকাতাই সংসার চলে। তারপর টানাটানি। মাঝে মাঝে মেলায় গান হলে টাকার টান কমে কিন্তু তাতে চলে না। তাই তাঁকে মাঠের কাজে যেতে হয়। কিন্তু এখন হঠাৎ তাঁর হাওয়া বদলের দিন। মনের কোণায় কামনা-বাসনের ছবি ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তার কাগজে মুড়ে যাচ্ছে। ট্রেনে ফেরার পথে সে ভাবে পোশাকটাকে আরো ঝলমলে করতে হবে। জাদুকরের মতো আর একতারার খোলের গায়ে পালিশ দিয়ে করতে হবে চকচকে। ভাবনাগুলো অপ্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু এতদিনের এই অনাড়ম্বর জীবন থেকে বেরিয়ে আসার মধ্যেও যেন কষ্ট। এখন মাঝে মাঝেই কলকাতা থেকে তাঁর ডাক আসবে। বড় বড় লোকদের সঙ্গে তাঁর ওঠা-বসা। অভাবটা এবার দূর হবে। কিন্তু,

“এই কষ্টের জীবন, অভাব ক্রমশ ফুরিয়ে যাচ্ছে বলেই কি ভিতরে ভিতরে আরেকটা কষ্ট, আরেকটা কল্পনা বেড়ে উঠছে? নিশি ভাবল দুঃখ হারিয়ে ফেলার ভিতর দুঃখ থাকে? এটাই কি তবে বাসনা লোভ? প্রাপ্তির আনন্দ প্রথম জীবনের দুঃখ সরিয়ে দুঃখ হয়েই আসে?”^{১০}

দুঃখ সরে যাওয়ায় তাঁর চোখ দিয়ে জল ঝরছে। এ কি আনন্দের কান্না, না কি দুঃখ হারিয়ে যাওয়ার দুঃখে বেসামাল মন ছুটি চাইছে? নিশি এখন ধীরে ধীরে কলকাতার মাটিহীন সংস্কৃতির মধ্যে ঢুকে পড়ছে। সে শুনে এসেছে, আগামী অনুষ্ঠানগুলোতে পোস্টারে বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকবে ‘স্বনামধন্য নিশি বাউলের গান’ ইত্যাদি। কিন্তু নিশি এসব চায়নি। চেয়েছিল, অভাব বাড়ার আগে গান গেয়ে কিছু টাকা রোজগার করতে। চির বৈরাগী নিশির গুরু। তিনি কোনোদিন কলকাতায় গান করতে যাননি। সে যখন গুরুকে বলত, প্রচার না পেলে পেট ভরবে না, তখন গুরু বলতেন যে, অভাবের মধ্যে দুঃখ যত, আনন্দও তত। দুঃখ সহ্য করার একটা আনন্দ আছে। মনের মধ্যে একটা শক্তি পাওয়া যায়। গান ভিতর থেকে উঠে আসে। বানাতে হয় না। তাছাড়া দুঃখ আছে বলেই তো স্কুলে না গিয়েও তিনি সব বুঝতে পারেন। জীবনটা এত টান টান। এত আনন্দ গান ছাড়া আর কে দেয়? নিশি অবাক হয়ে যেত। দুঃখ আর আনন্দের কোনো প্রভেদ বৈরাগীর কাছে ছিল না। এত বড় মাপের মানুষ অথচ সাধ্য-সাধনা করেও কেউ তাঁকে কোনোদিন কলকাতায় গান গাইতে নিয়ে যেতে পারেনি। অথচ অভাব তাঁর নিত্য সঙ্গী। নিশি দেখত, ভিক্ষা পেলে তবেই গুরুর আখড়ায় চুলো জ্বলত, হাঁড়িতে চাল চড়ত। সকাল বিকাল সাধন-ভজন হত। নিশি এসব দেখে একবার গুরুকে কলকাতায় গান গাইতে যাওয়ার কথা বললে গুরু তাঁকে বলেছিলেন, -

“...ওখানে গেলে মনটা ঠিক গানে ফিরতে চায় না। বলতে পারিস ওসব এক ধরনের ক্ষ্যাপামি।”^{১১}

কিন্তু নিশি জানে, বৈরাগী কলকাতা গেলে তাঁকে ঠেকাত কে? অর্থ-যশে তিনি বিখ্যাত হয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি তো গেলেন না। কতজন ক্যাসেট করার আগে তাঁর কাছে তালিম নিয়ে গেছে। প্রণাম করে পায়ের কাছে প্রণামী রেখে সম্মান দিয়েছে। অথচ সেই মানুষ না গেলেন কলকাতা, না করলেন ক্যাসেট। গুরুর কথায় নিশির মনে পড়ে যায়, তাঁর পঁচিশ বছরের জীবন। জয়দেব মেলায় গুরু গায়ন-বায়ন দিয়ে তাঁকে একাই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন গান করার জন্য। সেই থেকে সে নিজে দল করেছে। গুরু বুঝেছেন, নিশি গানে বাউল, সাধনা তার জন্য নয়। তাই বায়না এলেই তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। কষ্টের দিনে যাতে একটু সুখের মুখ দেখতে পায়।

নিশি এখন বাউল গানে গ্রাম বাংলার জীবনে ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর মনে আটকে আছে, গুরুর সেই কথাটা, - দুঃখ না পেলে টান থাকে না জীবনে। কিন্তু অভাব আর দুঃখের পার্থক্যটা ঠিক কোথায়? নিশির দুঃখ অভাবে, গায়ে-গতরে। মনের ভিতরে দুঃখের কথা বলেছিলেন বৈরাগী অথচ বৈরাগীর মন জুড়ে শুধুই আনন্দ। মুখে মালিন্য নেই এক ফোঁটা। বুড়ো বয়সেও রসিকতা-হাসি-ঠাট্টায় মেতে ওঠেন। দেখে মনে হয় না, তাঁর দুঃখ আছে। অথচ লোকটা বলে দুঃখ আছে বলেই গাইতে পারি। দুঃখটা ঠিক কোথায় থাকে, নিশি তা জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। জীবন জুড়ে তারই সন্ধান করেছে

আর অভাবটাই দুঃখ হয়ে নেচে বেরিয়েছে। নিশি আজ কোন এক অলীক দুঃখের ভিতর চলে যাচ্ছে। এখন তাঁর অভাব নেই, এখন তাঁর যশ ও আনন্দপ্রাপ্তি।

“তবু কলকাতা থেকে সফল হয়ে ফেরার পর দুঃখের একটা বাঁশি যেন বয়ে বেড়াচ্ছে। মাটির টান? এই যে মাটিহীন সংস্কৃতির ভিতর চলে যাওয়া তার, চির বৈরাগী এই জন্যই কি গান গাইতে যায়নি কলকাতায়? চির বৈরাগী সুর আর কথাকে বেঁধে পচন ধরতে দেবে না বলেই কি ক্যাসেটের ডাক পেয়েও চুপচাপ। কিন্তু নিজেকে তো তুলে ধরতেই হবে। মানুষের কাছে পৌঁছাতেই হবে।”^{২২}

এই চাওয়া তো আজ সকলেরই। নিশি জানে, মাটির একটা মন আছে আর তা শুধু বাউলেরাই বুঝতে পারেন। কলকাতায় মাটি আছে মনের ভিতর। সেই মনের মাটিতেই কত অগণিত জনতার মধ্যে নিশি বেড়ে ওঠে, ছড়িয়ে যায়। সে জানে, মাটি বদলালে তার রঙও বদলায়। যে যাঁর নিজের মাটিতেই মাটির রঙে রাঙা হয়ে ওঠে। আনন্দ ও বিষণ্ণতায় তাঁর চোখের কোণে শুকনো জলের ছবি। একতারাটা বুকে নিয়ে নিশি উঠে দাঁড়ায়। তাঁকে তো উঠে দাঁড়াতেই হবে গানের জন্য। আকাশ আর বাতাস তাঁর সঙ্গী। মাটির টান। এত তীব্র মাটির রঙ? গানের গতি? মনের ব্যাকুলতা? সোদা গন্ধ? সে তো আগে জানত না! “নিশি বুঝল গানের চাষের জন্য মাটি দরকার। মাটি না হলে বেড়ে উঠবে কী করে দুঃখ, শোক, ব্যথা-বেদনার লোকায়ত জীবন? কলকাতার টাকার কত দুঃখ, মাটি দ্যাখেনি বলে। টাকা মাটি, মাটি...।

এই মাটিতে গানের গাছে এত টাকা ছিল!”^{২৩} সে তো কই আগে জানত না! নিশি অবাক হয় আর ওই না-জানার দুঃখেই তাঁর মনে দুঃখ গুনগুন করে ওঠে। মনটাকে হালকা করতে সে তাই একতারা আর বোষ্টমীকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে গান করতে চলে যায়। এ গল্পে বাউলের জীবন-দর্শন যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি নিশি বাউলের জীবন কথা ও তাঁর সব প্রাপ্তির মধ্যেও অপ্রাপ্তির বেদনা করুণ সুরে বেজে উঠেছে।

(ঙ)

‘আলখাল্লা ও একতারা’ একটি অসাধারণ গল্প। এক ফরাসি বিবাহ-বিচ্ছিন্না যুবতীর মনে-প্রাণে বাউল হয়ে যাওয়ার ও বাউলকে ভালোবেসে, তার আলখাল্লা ও একতারাকে নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেওয়ার বাসনার করুণ কাহিনি গল্পটিতে ধরা পড়েছে। গল্পে উঠে এসেছে শিষ্য-পরম্পরা ও কীর্তির মধ্য দিয়ে, গানের মধ্য দিয়েই যে মানুষ বেঁচে থাকেন, বাউল বেঁচে থাকেন, সেই চিরন্তন সত্যও। ফ্রান্সের প্যারিস শহরের লাক্সেমবার্গ মেট্রো স্টেশনে এই ফরাসি মেয়েটি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বেহালা বাজিয়ে গান করে। এখানেই একদিন লেখক তথা গল্পকথক তাঁকে গান গাইতে দেখেন। সকালে যাওয়ার সময় তাঁকে গান গাইতে দেখেন, দুপুরে ফেরার সময়ও দেখেন সে গান করছে। একটা ইউরো তাঁর বাক্সে দিয়ে লেখক তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন। ইভানা নামের বিবাহ বিচ্ছিন্না এই মেয়েটি লেখকেরই সমবয়সী। এখন সে রোজ গান করেই রোজগার করে। অন্য কিছু হয়ত করতে পারত। কোনো ট্রাভেল এজেন্সিতে চাকরি নিতে পারত। মাতৃভাষা ছাড়াও সে স্প্যানিশ, ইংরেজি, জার্মান ভাষা জানে। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা স্টেশনে দাঁড়িয়ে গান শোনানোর মতো নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল সে। সেখানে পড়াকালীনই বিবাহ সূত্রে আমেরিকায় চলে যায়। বছর চারেক পরে আবার একা হয়ে যাওয়ার বিষণ্ণতা নিয়ে প্যারিসে ফিরে আসে।

ইভানার সঙ্গে আলাপের পর কথক যখন তাঁর কাছে জানতে চান, সে কেন চাকরি না করে এমনভাবে গান গেয়ে বেড়াই, তখন ইভানা এমন একটা শব্দ উচ্চারণ করে, যার বাংলা অর্থ আঘাত। লেখক বাংলায় ‘আঘাত’ কথাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ইভানাও বাংলাতেই বলে ওঠে হ্যাঁ, আঘাত। তাঁর মুখে বাংলা শুনে লেখক অবাক হন এবং জানতে চান, তাঁর বাংলা ভাষা শেখার রহস্য কী? তার উত্তর না দিয়ে লেখককে নিয়ে ইভানা তখন মঁমার্ত স্টেশনের দিকে চলে যায়। আলখাল্লা পরে হাতে একতারা নিয়ে আশ্চর্য ছন্দে ঘুরে ঘুরে ভাঙা বাংলায় বাউল গান গাইতে থাকে, - ‘গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ...।’ এখন তাঁর মুখে সেই চিরায়ত হাসি। এখন তাঁর সুরে বিষণ্ণতা নেই, বেহালার বিরহ নেই। এখন তাঁর গলায় গঙ্গার জোয়ার। সে গলা ছেড়ে গায়, - ‘সে লীলা বুঝবি ক্ষ্যাপা কেমন করে...।’ বিচিত্র পোশাক আর তাঁর বাংলা গান মঁমার্তের

সন্ধ্যা মাতিয়ে রেখেছে যেন। তাঁর গানকে কেন্দ্র করে ভিড় বাড়ছে। সে হেসে দুলকি চালে একটার পর একটা গান করে যাচ্ছে। শেষে দর্শকদের বিদায় দিয়ে ইভানা লেখককে নিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে ডিনারের জন্য আর খেতে খেতে বলে চলে তাঁর জীবন-ইতিহাস। সে ছিল প্যারিসের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিকের ছাত্রী। পড়া চলাকালীন সময়ে সে এক আফ্রিকান ছেলেকে ভালোবেসে বিয়ে করে তার সঙ্গে আমেরিকায় চলে যায়। ছেলেটি ভালো গিটার বাজাত। কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়ে ছেলেটি শিকাগোয় এক বড় চাকরি পেয়েছিল। আমেরিকা গিয়ে ইভানা আবার মিউজিক নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে। সে সময় তাঁর মধ্যে পৃথিবীর মিউজিক বিষয়ে ধারণা তৈরি করে দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ডন নামের এক আমেরিকান অধ্যাপক। ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ইভানা বুঝতে চায় গানকে, বুঝতে চায় বিশ্ব-সংসারে এতসব সুরের প্রকারভেদ, সামগ্রিক গান-বাজনার জগৎটিকে। তাঁরা ভাবে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়ে সেখানকার গান ও সুর চর্চা করা দরকার। এটাই হয়ে যায় তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছরের একটি প্রকল্প বা প্রজেক্ট। সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার আগে আফ্রিকান ছেলেটি তার কাছে জানতে চায়, ইভানা এখনো তাকে ভালোবাসে কি না। ইভানা জানায় সে ভালোবাসে। তবে তাঁর সব থেকে বেশি ভালোবাসা আছে মিউজিকের প্রতি। ছেলেটি আর কিছু বলেনি। ইভানা আর গর্ডন বিদেশ সফরে বেরিয়ে পড়ে। তাঁদের সফর সূচির মধ্যে ছিল এশিয়া ও আফ্রিকার লোকসংগীতের কয়েকটি ধারা নিয়ে গবেষণা করা। সেই সুবাদেই ইভানা বছর দশেক আগে হাজির হয়েছিল কলকাতায় এবং সেখান থেকে বীরভূমের সাঁইথিয়ায় ময়ূরাস্বামী নদীর তীরে চণ্ডীদাস বাউলের আখড়ায়।

এখানে আসার আগে বাংলা ভাষা আর বাউল গান সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণাই ছিল না ইভানার। গর্ডনের কাছেই বাউলের ওপর ভিডিও, ছবি ও তথ্যচিত্র দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল। গর্ডন আগে একবার দিন পনেরোর জন্য কেঁদুলির জয়দেব মেলায় এসেছিলেন। রাত জেগে বাউল গান রেকর্ড করেছিলেন। দু-একজন বাউলের ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন। বাউল দর্শন সম্বন্ধে বেশ কিছু তাত্ত্বিক লোকের পরামর্শও রেকর্ড করেছিলেন। লোকায়ত চর্চার বিষয়টি তখনই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। চণ্ডীদাসের আখড়ায় এসে ইভানার বাংলা শেখার চর্চা শুরু হয়। এখানে সে পায় মাটির স্বাদ। আড্ডায়-হুল্লোড়ে বাংলার ধুলোর সঙ্গে সে ক্রমশ একাত্ম হয়ে যায়। জীবনকে সে জানতে চায়। ফলস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম পড়ে থাকে এক ধারে। বাংলাকে বুঝে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর কাছে বড় হয়ে ওঠে। তাঁর মনে হয়, তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে গান শেখা নিরর্থক। প্রাণ ছাড়া গান হয় না। এদিকে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করে ফিরে যেতে হবে আফ্রিকায় নতুন সুরের খোঁজে। ইভানা সিদ্ধান্ত নেয়, সে আর গবেষণা করবে না। বাউল গান নিয়েই কাটিয়ে দেবে বাকি জীবন। তার সিদ্ধান্তে গর্ডন খুশি হননি কিন্তু মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা আইন বিরুদ্ধ কাজ। তাই ইভানাকে ছেড়ে তিনি একাই চলে যান।

চণ্ডীদাসের আখড়ায় ইভানা ও গর্ডন লিভ টুগেদার থাকার সময়ে তাঁদের একটা বাচ্চা হয়। গর্ডন যাবার সময় জানিয়েছিলেন যে, এক বছর পর ফিরে এসে তিনি বাচ্চাটিকে নিয়ে যাবেন। কারণ প্যারিসে তাকে নিয়ে যাওয়ার নানা অসুবিধা ছিল। তাই ইভানা আরো এক বছর গর্ডনের জন্য চণ্ডীদাসের আখড়ায় অপেক্ষা করে। কিন্তু গর্ডন ফিরে আসেননি, খোঁজও নেননি, আর যোগাযোগও হয়নি। এক বছরের বেশ কিছু পরে বাচ্চাটি মারা গেলে ইভানা এখানে আর একা পড়ে না থেকে প্যারিসে চলে আসে। বিষাদের স্মৃতি নিয়ে দেশে ফিরে আসার সময় ইভানা শুধু আখড়ার স্মৃতি ধরে রাখার জন্য একতারা আর একটা বাউলের পোশাক চেয়ে নিয়েছিল চণ্ডীদাসের কাছ থেকে। হাজার টুকরো জোড়া সেই আলখাল্লাটাই সে এখন পড়ে আছে। হাতে সেই পুরনো একতারা। এখানে সে যেকোনো একটা চাকরি করতে পারত। কিন্তু তাঁর জীবন বিষাদে ভরে গেছে। তাই প্যারিসের ব্যস্ত জীবনে নিজেকে মিলিয়ে না দিয়ে নিজের ছন্দে ব্যক্তিগত শোক আর স্মৃতির পসরা নিয়ে দাঁড়িয়েছে মেট্রো স্টেশনে। যদি কোনোদিন গর্ডনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় কিংবা গাইতে এসে যদি চণ্ডীস্বামী তাঁকে চিনতে পারেন, সেই আশায়।

আখড়ার শূন্য স্মৃতি আর মৃত সন্তানের মা হয়ে একলা জগৎ রচনা করেছে ইভানা। সে আর বিয়ে করেনি, লিভ টুগেদারও করেনি। সে জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছে। সেই দুঃখের মধ্যেও চণ্ডীদাসের আলখাল্লা আর একতারা হাতছাড়া করেনি। ইভানাকে দেখে লেখকের মনে হয়েছে, তাদের মতো দুঃখ পাওয়া স্মৃতি-নির্ভর মানুষও এখনো এ দেশে থাকে?

প্যারিসের লোভনীয় জীবন থেকে ইভানা কীভাবে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পেরেছে, তা লেখকের জানা নেই। পরদিন ইভানা কিছু জিনিস কিনে লেখককে বলেছে, চণ্ডীদাস বাউলকে পৌঁছে দিতে। জিজ্ঞাসা করেনি, লেখক চেনেন কি না। চণ্ডীদাস যে তাঁর চণ্ডীক্ষ্যাপা, তা হয়ত ইভানার জানা নেই। জানা নেই, তাঁর মৃত্যুর খবরও। গত বছরই চণ্ডীক্ষ্যাপা মারা গেছেন কিন্তু লেখক সে খবর তাঁকে দিতে পারেননি। গতকাল তিনি ইভানার মুখে চণ্ডীক্ষ্যাপার নাম শুনেছিলেন। তবু তখন তাঁর মৃত্যুর খবর জানাতে পারেননি। ভাবতে পারেননি, সে চণ্ডীদাসের জন্য উপহার পাঠাবে। ইভানা দুঃখী মেয়ে। তাঁর জীবনের অনেক ভাঙাগড়ার সাক্ষী চণ্ডীদাসের আখড়া। এখন তাঁর প্রয়াণের খবর দিতে গেলে সে ভরসা পাবে কীভাবে? ‘শুধু তার আলখাল্লা আর একতারা? এ উপহার কিছু নয়, চণ্ডীক্ষ্যাপা যদি জানত এই পৃথিবী বিখ্যাত শহরে আলখাল্লা আর একতারার দাম এত, তাহলে নিজেই বিস্মিত হত। তারও ভাগ্যে পুরস্কার, গ্রান্ট, বিদেশ সফর কিছুই জোটেনি। একলা থাকা আপন ভোলা চণ্ডীদাস কিছুই পায়নি। এ জীবনে জানতেও পারেনি ইভানা তাকে এমনভাবে এখনো মনে রেখেছে, তার পোর্ট্রেট করিয়েছে ফরাসি চিত্রকরকে দিয়ে। ... একদিকে চণ্ডীক্ষ্যাপার প্রয়াণ, অন্যদিকে ইভানার কাছে তার চিরকালীন বেঁচে থাকা। ... চণ্ডীক্ষ্যাপা জানতে পারল না তার বিশ্ব পরিচয়। জানতে পারল না প্যারিস শহরে এখনো তার গান গাওয়া মেয়ে ঘুরে বেড়ায় তারই মতো, অথচ যে মেয়েটি ইচ্ছে করলেই শিকাগোতে অধ্যাপনা করতে পারত।’^{১৪} কিন্তু ইভানা চাকরি করতে চায় না। সে বাউলের আলখাল্লা আর একতারা নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিতে চায়। এ দুটি তার মরণেরও সঙ্গী। চণ্ডীক্ষ্যাপার প্রেমে ইভানা আর লেখক হারিয়ে যেতে থাকেন আর মনের ভিতর অচিন পাখি খাঁচা ভেঙে উড়ে যেতে চায়। আসলে চণ্ডীক্ষ্যাপাদের মৃত্যু নেই। তাঁদের মৃত্যু হয় না। কেবল পার্থিব শরীর ছেড়ে যায় গান। গান তো মরে না। গান তাঁদের বাঁচিয়ে রাখে। চণ্ডীক্ষ্যাপারা তাই বেঁচে থাকেন। পার্থিব উপহার এসব ভাবনার কাছে তুচ্ছ। ইভানা এটা বোঝে। সেজন্য সে নির্লিপ্ত, চাওয়া-পাওয়া শূন্য এক বাউলানি।

চণ্ডীক্ষ্যাপার আখড়া এখন তাঁর শিষ্যদের। তরুণ ছেলেটি যে আখড়া নিয়ে পড়ে আছে, ইভানাকে সে চেনে না। তবে গুরুর মুখে তার গল্প শুনেছে। ইভানার কথা প্রসঙ্গে গুরুর কাছে রেখে যাওয়া তার তরঙ্গটি বের করে দেয় লেখকের সামনে। বলে, গুরু বলেছিলেন মেয়েটি ফিরে এলে দিয়ে দিতে। কিন্তু সে তো আর আসেনি। লেখক খুলে দেখেন, ইভানার সেই হাতেখড়ি হওয়া বাংলা খাতা আর কারুকাজ করা ফরাসি চপ্পল, যা সে এখানে এসে আর ব্যবহার করেনি। ছেলেটির অনুপস্থিতিতে লেখক সেই চপ্পলের ওপর চুম্বন করেন। তা কি চণ্ডীক্ষ্যাপার স্মৃতির প্রতি, না কি সচেতন কোনো ভ্রমে? তার উত্তর তাঁর কাছে নেই। জীবনে এসবের উত্তর “পাওয়া যায় না বলেই হয়ত হঠাৎই শূন্য থেকে সম্পর্কের অবাধ করা সমীকরণ জীবনে এসে দাঁড়ায়। যা হবার ছিল না তাও হয়ে যায়। ইভানা সেই এক তারায় আটকে পড়া সুর, আলখাল্লায় পেয়ে যাওয়া পৃথিবী।”^{১৫}

(চ)

‘দেহতত্ত্ব’ গল্পে অভাবী বাউলের ব্যক্তিগত জীবন কথা যেমন এসেছে, তেমনি দেহতত্ত্বের পাঠ নিতে আসা কলকাতাবাসী এক যুবকের মধ্যে বাউলের বোষ্টমী তাঁর ‘মনের মানুষ’ খুঁজে পেয়ে কীভাবে খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছিল, সে কথাও রয়েছে। সেই সঙ্গে বাউল-দর্শন ও সাধনতত্ত্বের কিছু প্রসঙ্গও গল্পে এসেছে। গল্পে দেখা যায়, হরিদাস বাউলের সঙ্গে তাঁর বোষ্টমীর সম্পর্ক আজ আর তেমন মধুর নয়। দিন দিন তাঁদের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে। তাঁর প্রতি বোষ্টমীর অশ্রদ্ধার মনোভাবও হরিদাস টের পায়। কিন্তু সে কী করবে? গান করা ছাড়া সে তো আর অন্য কিছু করতে পারে না। যদিও আজকাল তাঁর নাম-ডাক হয়েছে। বিভিন্ন বাউল অনুষ্ঠানে তাঁর নিয়মিত ডাক পড়ে। আর মোটামুটি সাত-আটশো টাকায় এক রাতের বায়না হয়। “এই রাত্তির আর শ্রোতাগুলোই হরিদাস বাউলকে অনেকখানি পালটে দিয়েছে। এখন আর সুতির কাপড়ে মঞ্চে উঠলে বড় একটা কেউ পাত্তা দেয় না, ছবি তোলে না কেউ। তাই একতারাটিকে চকচকে করতে হয়েছে যেমন তেমনি রজন ঘষে তারটাকে টান টান করে গলার সঙ্গে বাঁধতে হয়েছে। আর সুতির পোশাকের বদলে এখন সিল্কের হাঁটু ছোঁয়া পাঞ্জাবি আর কোমর বন্ধনী। ...

সিক্কের পোশাকে বলমল করে ওঠে সারা শরীর। গানের মেজাজটাও চড়ে যায়। নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে রাত কেটে যায়। শ্রোতার আনন্দে আটখানা।^{১৬} কিন্তু বৈষ্ণবী তাঁর বেজায় চটা। অভাবের সংসারে সে যেন মানিয়ে নিতে পারছে না। হরিদাস বুঝেছে সঞ্চয়হীন সংসারের রীতি-নীতি এখন আর বাউলদের জন্য নয়। অভাব এখন একটু বেড়েছে। শীত না এলে কমবে না। ভিক্ষায় বেরিয়েও এখন গেরস্থকে গান শুনিয়ে আর তেমন ভিক্ষা পাওয়া যায় না পাড়াগাঁয়ে। ভিক্ষা ছেড়ে তাই এখন ঘরে বসে একতারা, দোতারার ব্যবসা করে হরিদাস। যদিও সারা বছর অর্ডার থাকে না। এই গ্রীষ্মের সময় অভাবটা বেড়ে বাউল আর বোষ্টমীর মাঝখানে মরা নদীর মতো শুয়ে থাকে। বোষ্টমী কোনো কথা বলে না, মুখ বুজে থাকে। হরিদাসের নতুন বায়নার আসরে সে যেতে রাজি হয় না। জানে যে, যে ক'টা টাকা পাওয়া যাবে, তা দিয়ে চাল, ডাল না কিনে হরিদাস গাঁজা খেয়ে আর ফুটি করে উড়িয়ে দেবে। তাই সে বাউলের প্রতি বিরূপ। বাউলের রূপ-রস-মাটি নিয়ে যে কর্ম, তা করতেও বোষ্টমী নারাজ। বাউল জানে, তাঁর স্ত্রী ঋতুমতী। কিন্তু এবার সে চারচন্দ্র সাধনায় উৎসাহী নয় বলে বাউলের রূপ-রস-মাটির কর্ম এ মাসে আর করা হল না হরিদাসের।

বাউলদের জীবনটা প্রকৃত অর্থেই নয়-ছয়ের জীবন। পাখিদের মতো সঞ্চয়হীন। যদিও সময়ের সংঘাতে এখন কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে বাউলদের জীবন। এখন অধিকাংশ বাউলেরই ছেলেমেয়ে রয়েছে। অথচ প্রকৃত বাউলের না কি সন্তানের জন্মদান নিষেধ। লালন ফকিরের কোনো সন্তান ছিল না। হরিদাসও এখনো পর্যন্ত সন্তানের প্রয়োজন অনুভব করেনি। গত বছর হরিদাসের কাছে জয়দেব মেলায় দেহতত্ত্বের গান ও ব্যাখ্যা শুনে মোহিত হয়েছিল কলকাতাবাসী এক যুবক। সে হরিদাসের কাছে শুনেছিল, বাউলেরা সারারাত সঙ্গম করলেও তাঁদের স্থলন-পতন হয় না। তাই সে মাঝে মাঝেই হরিদাসের আখড়ায় দেহতত্ত্বের গান শুনতে আসত। এবার সে এসেছে দেহতত্ত্ব শিখতে। যাতে সে দীর্ঘ সময় ধরে স্থলন-পতনহীন মিলনে রত থাকতে পারে। এ ক্ষমতা আয়ত্ত্ব করতে পারলেই অনন্ত স্ফূর্তি। হাতের মুঠোয় তখন পাওয়া যাবে যৌবনকে। যৌনতার চরম সুখ নিতে তাই সে এসে হরিদাসকে জানায়, তাকে দেহতত্ত্ব শেখাতে হবে। কিন্তু এ যে অত্যন্ত গোপন কর্ম! অদীক্ষিত কাউকে যে তা শেখাতে নেই, হরিদাস জানায়। যুবকটি মনঃক্ষুণ্ণ হয়। তার কি তবে যৌনতার চরম স্বাদ নেওয়া হবে না? হরিদাসের বোষ্টমী অনুচ্চ স্বরে বলা সে কথা শুনতে পাওয়ায় বাউলের অনুপস্থিতিতে যুবকটিকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে যৌনতার পাঠ শেখাতে রাজি হয়। বলে, চারদিন পর বাউল যখন থাকবে না তখন আসতে। বোষ্টমী জানে, সঙ্গমে হরিদাসের অসীম ধৈর্য। তবে বাউল এখন নিরাসক্ত। কিন্তু বোষ্টমীর সেদিকে প্রবল আগ্রহ রয়েছে। যুগল সাধনা তো কেবল পুরুষের নয়, কিছুটা নারীরও। সেও কিছুটা জানে সংঘমের প্রক্রিয়া। অভাবের সংসারে হরিদাসের প্রতি এখন তার কোনো শ্রদ্ধা নেই। হরিদাসের উদাসীনতার কারণে তাঁর সঙ্গে বসবাসে এখন আর বোষ্টমী সুখী নয়। হরিদাস বোঝে, তাঁর খাঁচার পাখি শিকল কাটতে শুরু করেছে। হরিদাস তো প্রকৃত অর্থে এক উদাসীন বাউল। তাঁর সাধন-ভজন--- সবই পুরানো বাউলদের মতোই। কোথাও কৃত্রিমতা নেই। পোশাক আর একতারাটায় যা একটু পরিবর্তন হয়েছে। না হলে যা কিছু সাধনতত্ত্ব - সবই রয়েছে তাঁর মনে একজন আদর্শ বৈরাগী বাউলের মতোই।

হরিদাসের বৈষ্ণবী কণ্ঠী বদল করে হরিদাসকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করলেও প্রকৃত অর্থে সে সহধর্মিনী নয়। বাউল জীবন-দর্শনকে সে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। বাউলের মতো ব্যাকুল হয়ে 'মনের মানুষ' খোঁজার অশ্বেষণে সে যাত্রা করেনি। আসলে সে সুখ চায়, সন্তান চায়। বাউলের গভীর দার্শনিক জীবনতত্ত্ব থেকে তাঁর আর কিছু শেখার নেই, নেওয়ার নেই। হরিদাসের কাছে দৈহিক সুখ অনেক পেয়েছে। এখন সে চায় বাস্তবের সুখ, সন্তান-সুখ। দশ বছরের সংসারে তাঁদের কোনো সন্তান আসেনি। সংসারে মন মজাতে না পেরে তাই সে এবার উড়ে যেতে চায় অন্য কোথাও। কলকাতাবাসী যুবকটিকে আখড়ায় হরিদাসের অনুপস্থিতিতে দেহতত্ত্বের পাঠ শেখাতে গিয়ে তার সঙ্গেই চলে যায় আখড়া ছেড়ে। এখন সে ঘোর সংসারী, পতি সেবায় নিমগ্ন এক নারী। তার সঙ্গে সঙ্গে বাউল গানের দালালও। বাউলদের প্রোগ্রাম দিয়ে টাকা খায়, গানের ব্যবসা করে।

এদিকে চারদিন পর হরিদাস আখড়ায় ফিরে এসে দেখে তাঁর স্ত্রী নেই। আখড়া জুড়ে শূন্যতা। বুঝতে পারে, সে তাঁকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। মনে মনে হরিদাস কাতর হয়, দুঃখ পায়। বোঝে, বাউলদের চিরদিনই 'মনের মানুষ' খুঁজে ফিরতে হয়। আজীবন এই খুঁজে ফেরাটাই বাউল দর্শন। হরিদাস কি আবার এক ভুল থেকে অন্য ভুলে প্রবেশ

করে খুঁজে ফিরবে তাঁর 'মনের মানুষ?' সে তা জানে না। হরিদাস বুঝতে পারে, বাউলদের জীবন আসলে সঞ্চয়হীন। টাকা-পয়সা তো দূরে থাক, নিজের স্ত্রীও কখনো আজীবন সঞ্চয় থাকে না। হরিদাস এই বোধ হারিয়ে স্ত্রীর মায়ায় জড়িয়ে পড়েছিল বলেই তার চলে যাওয়ায় সে কষ্ট পায়। স্ত্রীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা তাঁর জীবনে আঘাত হয়েই ফিরে আসে। সেই আঘাত সে সহ্য করতে পারেনি, পারেনি বিশ্বাসভঙ্গের নিদারুণ যন্ত্রণাও সহ্য করতে। সেজন্য স্ত্রীর চলে যাওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই এই মায়া পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে সেও অনন্তের পথে যাত্রা করেছিল।

গল্পটি একদিকে যেমন বাউলের সুখ-দুঃখময় জীবনের গল্প, অন্যদিকে তেমনি দুই ভিন্নধর্মী আদর্শবোধেরও গল্প। হরিদাস বাউল-জীবনাদর্শকে তাঁর জীবনের মন্ত্র করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে বোষ্টমী চেয়েছিল সন্তান, চেয়েছিল সংসারের সুখ। বাউল-দর্শনকে তাই সে গ্রহণ করেনি, গ্রহণ করেছে সংসার ধর্মের আদর্শ। সেজন্য সে বাউলকে ছেড়ে গেছে। সংসারের অভাব তাঁদের মধ্যে দূরত্ব বাড়ালেও ভিন্ন জীবন বোধই তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদের পথকে প্রশস্ত করেছে। একদিকে পাওয়ার আনন্দ, অন্যদিকে হারানোর বেদনা - এই দুইয়ের মিশ্রণে গল্পটি শেষ পর্যন্ত করুণ রসান্বিত হয়ে উঠেছে।

(ছ)

'এক বাউলের বৈঠক' গল্পটি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে বাউল ভাবনার ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। গল্পটিতে একদিকে যেমন বর্তমান সময়-প্রেক্ষিতে বাউলের তত্ত্ব-দর্শন ও ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা বিচার করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি বাউলের প্রতি মানুষকে সহানুভূতিশীল, শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ও দায়িত্ব-কর্তব্যবোধে ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। গল্প-কথক দিগন্ত বাউলের মুখেই একতরফাভাবে গল্পটি বিবৃত হয়েছে। টেকনিকের দিক থেকে এটি হয়ত লেখকের এক ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। দিগন্ত বাউল নিজেকে দিগন্তদাস বাউল বলতে চান না। তাঁর বক্তব্য হল, 'দাস' পদবি প্রকৃত বাউলদের জন্য। তিনি প্রকৃত বা পূর্ণাঙ্গ বাউল নন। কেবল বাউলের পোশাক পড়ে গান গেয়ে বেড়ান, গান লেখেন, সুরও দেন। আমাদের মতে, তিনি আসলে শিল্পী-বাউল। তবে বাউল সাধনার তত্ত্ব-দর্শন তাঁর অজানা নয়। নিজের বোধ ও বুদ্ধির দ্বারা তিনি বাউলের জীবনতত্ত্ব ও দর্শনকে ব্যাখ্যা করে বাউলের উদার, প্রগতিশীল মনোভাবকে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি বর্তমান যুগ প্রেক্ষাপটে বাউল জীবন-দর্শন ও ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা যে কতখানি, তাও বোঝাতে চেয়েছেন। আসলে বলা ভালো যে, বাউল ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরতে গিয়ে বাউলের যুগোপযোগী প্রগতিশীল ভাবনাগুলি উঠে এসেছে।

বাউল সাম্যবাদী বিশ্বাসী বলেই তাঁর কোথাও কোনো অসাম্যের চিহ্ন রাখেননি। বাউলের পোশাকই তার বড় প্রমাণ। বাউল তাঁর আলখাল্লাকে এমনভাবে তৈরি করেছেন যে, তা নারীর, না পুরুষের, বোঝার উপায় নেই। পুরুষ পরলে তখন তা পুরুষের, আবার নারী পরলে তখন তা নারীর। বাউলের আলখাল্লায় নারী-পুরুষের তফাৎ ঘুচে গেছে। শুধু কি পোষাকে? বাউলের জীবন-দর্শনে ও ভাবনায়ও এই তফাৎ কোথাও নেই। বাউল সমতা চান বলেই নারী-পুরুষের সামাজিক ভেদ-পরিচয়কে অস্বীকার করে উভয়কে এক করে 'মানুষ' পরিচয়ে বড় করে তুলেছেন।

“নারী-পুরুষের ভেদরেখা তার জেগারে। আচার ব্যবহার অন্যান্য ক্ষেত্রে জেগার ডিসক্রিমিনেশন হওয়াটা ঠিক নয়, ...।”^{১৭}

বাউলেরাও এই কথাই বলেন। লিঙ্গ সমতা বাউলের দর্শন। বাউল লিঙ্গ সমতা চান বলে, মনকে সেই দর্শনে বশ করতে চান বলেই তাঁরা চারচন্দ্রের সাধনা করেন। বাউলের চারচন্দ্রের সাধনা কেবল ক্রিয়ামাত্র নয়, কেবল জীবন-যাপনের অঙ্গমাত্র নয়। তা আসলে মনকে স্থিতিশীলতায় আনার এক কার্যকরী ব্যবস্থা, - সাম্যে স্থিতিশীল হওয়ার প্রাথমিক পন্থাও। আর এই সাম্যের চূড়ান্ত পর্যায় হল, জগতের সব কিছুকেই সমান চোখে দেখা। সবাইকে নিজের মনে করা। তাই বাউল মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীদেরও সমান চোখে দেখেন। বাউল মনে করেন যে, -

“পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী বা বস্তুর মূল্য সমান, মানুষ হিসেবে সে বাড়তি সুযোগ নিয়ে তাদের ওপর খবরদারি চালাবে না।”^{১৮}

বাউলেরা তাই সবাইকেই সমান চোখে দেখেন আর মানুষ যে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তা মনে করেন। সেজন্য সবার ওপরে মানুষকে, মানবতাকে স্থান দিয়ে মানুষ-ভজনার কথা বলেন। তাঁদের কাছে মানুষ 'রতন ধন'। বাউলেরা তাঁদের গানে বলেছেন, -

“মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।

মানুষ ছেড়ে ক্ষ্যাপারে তুই মূল হারাবি।।”^{১৯}

এই মানুষকে চেনার জন্য আত্মতত্ত্ব জানা প্রয়োজন। এর মূল কথা, নিজের 'আমি' সত্তাকে জানা। নিজেকে জানলেই অন্যকে জানা যায় বলে বাউল বিশ্বাস করেন। আর অন্যকে জানলে জগতের সবকিছুর মধ্যেই 'আমি'-কে আর নিজের 'আমি'র মধ্যে জগৎকে তাঁরা দেখতে পান। বাউলের কাছে জগৎ তখন আমিত্বময় মনে হয়। এই 'আমি' সত্তাই বাউলের মানুষ সত্তা। বাউলের মানুষ-ভজনার সার। এই 'আমি' সত্তার অন্বেষণের জন্যই বাউল মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূরে সরিয়ে রাখতে চান। বৈষম্যকে দূর করে এক 'আমি' সত্তায় উপনীত হতে চান। মানুষকে জানার কথা, মানার কথা বলেন। বাউলের মোহহীন, আসক্তহীন হওয়ার পিছনে তাঁর সাম্য-ভাবনার বীজ লুকিয়ে আছে।

বাউলের পরকীয়াতত্ত্ব আমাদের মতে, পরদার হলেও বাউল তার অন্য অর্থ করেছেন। তাঁরা মনে করেন, পরকীয়া আসলে পরদার নয়, তা প্রকৃতি-সঙ্গ। এই প্রকৃতি-সঙ্গের মধ্য দিয়ে বাউল একদিকে যেমন পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে চান, অন্যদিকে তেমনি নিজের 'আমি'-কে খুঁজে পান। নিজেকে চিনতে, জানতে পারেন। তাই তাঁদের মতে, পরকীয়া গর্হিত কিছু নয়। বাউল তাঁদের গানে, যে 'বেঁচে মরা'র কথা বলেন, তার মধ্যে প্রকৃত কোনো বিরোধ নেই। আসলে বাউল দেহে আসক্তহীন হয়ে মনকে সজীব রাখতে চান, বাঁচিয়ে রাখতে চান। জগতের প্রতি উদার ও উদাসীন হয়ে মানব জীবনের সার্থকতা খোঁজেন। তবে বাউলেরা ভাব-শূন্য হতে নিষেধ করেছেন। তাঁদের গানে আছে, -

“ভাব শূন্য হইলে হৃদয়

বেদ পড়িলে কী ফল দেয়,

ভাবের ভাবে থাকলে সদায়

গুপ্ত ব্যক্ত সব জানা যাবে।।”^{২০}

বাউল তাঁর মনে ভাবের উদয় ঘটিয়ে যুক্তি ও বোধের দ্বারা নিজের 'আমি'-কে খুঁজতে চান। নিজের আরশিতে নিজেকে দেখতে চান, যাচাই করতে চান। সেজন্য ভাব-শূন্য হওয়াকে বাউল ব্যঙ্গ করেছেন।

মানুষ যেমন নিজেকে পূর্ণভাবে জানতে চায়, পেতে চায়, তেমনি তার মতো আর একজনকেও কাছে পেতে চায়। কিন্তু মানুষ নিজেকে কখনো পূর্ণভাবে পেতে পারে না। কারণ সে একা তো পূর্ণ মানুষ নয়। অথচ পূর্ণ হওয়ার তার বড় সাধ। নিজে পূর্ণ না হওয়ায় অন্যকেও সে পূর্ণভাবে নিজের মনের মতো করে পায় না। ফলে মনে জন্ম নেয় হতাশা, আক্ষেপ। কিন্তু এটা যে ছিলনা, আত্ম-প্রবঞ্চনা, লালন ফকির তাঁর গানে কবেই তা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, -

“সে আর আমি অচিন একজন

এক জায়গাতেই থাকি দুজন

ফাঁকে থাকি লক্ষ যোজন

না পাই দেখিতে।।”^{২১}

বর্তমানে একশ্রেণির মানুষ সমাজে মানুষে মানুষে সমতা চান। কিন্তু সমতার মূল মন্ত্র যে অন্যকেও নিজের মতো করে দেখতে শেখা, তা সর্বদা পারেন না। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে এক করে দেখতে পারেন না বলেই সমাজের নানা ক্ষেত্রে আজও নারী-পুরুষের বিভাজন বর্তমান। বাউল ফকিরেরা তা চান বলেই সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে সমতার পরিপন্থী সব কিছুকেই তাঁরা নাকচ করে দিতে বদ্ধপরিকর। নারী-পুরুষের বিভেদ যে সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধা স্বরূপ, তা কত আগেই তাঁরা বুঝে এর প্রতিকার করতে চেয়েছিলেন। যুগের থেকে তাঁরা ছিলেন অগ্রগামী, প্রগতিশীল। সেজন্য তাঁদের

সব কিছুই নির্বিশেষে মানুষের জন্য। তাঁদের সমাজ ভাবনা, মানব ভাবনা আজকের যুগে যে কত প্রাসঙ্গিক, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। বর্তমান সমাজের মূল সমস্যাগুলির কবেই তাঁরা প্রতিকার করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য বাউল ফকিরেরা এমন এক জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছিলেন, যা ছিল জীবন-যাপনের অনুকূল এক আদর্শ ব্যবস্থা। বাউল ফকিরি সাধনা কেবল সাধনামাত্র নয়, তা এক আদর্শ জীবন-যাপনের বিধিও, - তা এক যাপন পদ্ধতি। এই যাপনের মূল কথা, বিভেদহীন সাম্য ও মৈত্রীর সাধনা। আসলে বাউল হল বিবেক।

“বিবেক মানে নিজেকে যাচাই করার পথ। ভাবনা ভাবার একটি নিরপেক্ষ উপায়, যা আমাদের জাগিয়ে রাখে।”^{২২}

তবে বাউলের এই ভাবনা যে, সময়ানুসারে বদলাবে, এটাই স্বাভাবিক। বর্তমানে বাউল ভাব-সাধনায় ডুব না দিয়ে একদল মানুষ বাউলের স্টাইল আর সুর দিয়ে গান লিখছেন, গাইছেন। তাতে কি বাউলের কোনো ক্ষতি হচ্ছে? না। আসলে -

“... প্রত্যেক যুগেই মূল বিষয়ের বাইরে আরেকটা জগৎ থাকে। সে নিজেকে লঘু করে বলেই মূল জায়গাটিকে নিতে সুবিধে হয়। ওই যেমন লালনের যুগের শেষ দিকে উঠে এসেছিলেন ফকিরচাঁদের দল। ওরা শুধু গানই করতেন। সাধনা করতেন না। কিন্তু ওঁদের দলের প্রত্যেককেই সেই ভীষণ বোধের ভিতর থাকতেন বলে তাঁদের সাধনা পদ্ধতি ছাড়া গানও মানুষের মন দখল করে নিল। ফকিরের গানের তুলনায় হালকা তাঁদের গান। কিন্তু ফকিরকে বোঝার জন্য ফকিরচাঁদের গানের দরকার ছিল।”^{২৩}

আসলে বাউলের গান গতিশীল। আর যা গতিশীল, তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। এতে আক্ষেপের কিছু নেই। বাউলের গান গেয়ে, গান লিখে কত মানুষ ধনী হয়ে গেলেন। কিন্তু বাউলের জীবন কি তাতে পালটেছে? তাঁদের অধিকাংশই যে-অন্ধকারে ছিলেন, আজও সেই অন্ধকারেই। তাই বিবেকবান, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের বাউলদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কর্তব্যবোধে ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দিগন্ত বাউল। যাতে তাঁরা বিনা চিকিৎসায়, অনাহারে মারা না যান। বর্তমান সময়ে এই উদ্যোগ খুবই প্রাসঙ্গিক এবং সাধুবাদের যোগ্য। গল্পটিতে যেভাবে বাউলকে দেখানো হয়েছে, তার ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা হয়েছে, তা সত্যই প্রশংসনীয়।

পরিশেষে বলা যায়, লেখক ধনঞ্জয় ঘোষাল তাঁর গল্পগুলিতে বাউল ফকিরদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-ভালোবাসা, স্নেহ-প্রীতি-ভক্তি-নিষ্ঠা, উদারতা, কর্তব্য পরায়ণতা ও ব্যথা-বেদনাময় জীবনের আলেখ্য যেমন নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতায় বাস্তবের তুলিতে তুলে ধরেছেন, তেমনি তাঁদের সাধনতত্ত্ব ও দর্শনেরও পরিচয় দিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁদের ভাবনা-চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রগতিশীল মনোভাবকেও বর্তমান সময় ও সমাজ প্রেক্ষিতে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। সব মিলিয়ে তাঁর গল্পগুলিতে বাউল ফকির জীবনের বিস্তৃত পরিচয় ও পরিসর যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি সেগুলি পরম উপভোগ্যও হয়ে উঠেছে।

Reference:

১. ঘোষাল, ধনঞ্জয়, ‘অচিন পাখি ও অন্যান্য গল্প’, সারস্বত কুঞ্জ, কলকাতা, ২০২৩, পৃ. ১৭২
২. তদেব, পৃ. ১৭৪
৩. তদেব, পৃ. ১৭৬
৪. তদেব, পৃ. ১৮০
৫. তদেব, পৃ. ১৮১
৬. তদেব, পৃ. ১৮৭
৭. তদেব, পৃ. ১৯৬
৮. তদেব, পৃ. ২০৩

৯. তদেব, পৃ. ২০৬

১০. তদেব, পৃ. ২০৮

১১. তদেব, পৃ. ২১০

১২. তদেব, পৃ. ২০৯-১০

১৩. তদেব, পৃ. ২১০

১৪. তদেব, পৃ. ২২৮-২৯

১৫. তদেব, পৃ. ২৩০

১৬. তদেব, পৃ. ২৩১

১৭. তদেব, পৃ. ২৫৬

১৮. তদেব

১৯. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ : 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৬৬৮

২০. তদেব, পৃ. ৬৬৯

২১. 'অচিন পাখি ও অন্যান্য গল্প', পৃ. ২৫৪

২২. তদেব, পৃ. ২৫৯

২৩. তদেব

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : 'বস্তুবাদী বাউল' : শক্তিনাথ ঝা, 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'সহজ বাউল' : সোহাৱাব হোসেন, 'বাউল ফকির কথা' : সুধীর চক্রবর্তী, 'বাংলাদেশের বাউল' : আনোয়ারুল করীম।